১

উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

মোঙ্গলরা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও নির্ভীক প্রকৃতির লোক ছিলেন। ভারত ইতিহাসে এই 'মোঙ্গল' কথাটি থেকেই মুঘল অথবা মোগল কথাটির উৎপত্তি। মোঙ্গলদের আদি নিবাস ছিল বর্তমান মোঙ্গলিয়া। মোঙ্গল জাতি কয়েকটি উপদলে বিভক্ত ছিল। তেমুচিন নামক এক মোঙ্গল নেতা, যিনি পরবর্তীকালে 'চেঙ্গিস খাঁ' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন তিনি সব উপদলগুলোকে একত্রিত করেন এবং দুর্ধর্ষ তাতার জাতিকে পরাজিত করার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী রাজ্য গঠন করেছিলেন। চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্য বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র চাঘতাই খাঁ মধ্য এশিয়ায় রাজত্ব করতেন। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে এই চাঘতাই রাজ্যেই তৈমুর লঙ্গের আবির্ভাব যিনি ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে সুলতানি সাম্রাজ্য ধ্বংস করেছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবুর ছিলেন মধ্য এশিয়ার সমর বিজেতা চেঙ্গিস খাঁ ও তৈমুর লঙ্গেরই উত্তরপুরুষ। তিনি ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে ভারতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে এদেশে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন (১৫২৬ খ্রি.) করেন। চার বছর রাজ্য শাসনের পুরো সময়টাই তাঁকে রাজ্য বিস্তারে এবং আফগান ও রাজপুত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যয় করতে হয়েছিল। ফলে তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যকে সুসংগঠিত করে যেতে পারেননি। তাঁর পুত্র হুমায়ুন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে নানারূপ সমস্যার সম্মুখীন হন। তিনি শূর আফগান নেতা শেরশাহের হস্তে পরাজিত হয়ে দিল্লির সিংহাসন হারিয়ে দেশে বিদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। অতপর বিদেশে অবস্থানকালে শক্তি সঞ্চয় করে দীর্ঘ পনর বৎসর পর হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন। এভাবে মধ্যযুগের ভারতে মুগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

আলোচ্য 'উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা' শীর্ষক ইউনিটকে নিম্নোক্ত তিনটি পাঠে বিভক্ত করে আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে ঃ

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- পাঠ-১. মুঘল যুগের ইতিহাসের উৎস
- পাঠ-২. বাবুর
- পাঠ-৩. হুমায়ুন

পাঠ - ১

মুঘল যুগের ইতিহাসের উৎস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *মুঘল যুগের ইতিহাসের উৎস হিসেবে সরকারি দলিলপত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *মুঘল যুগের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, সমকালে ফারসি ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *মুঘল যুগের ইতিহাস রচনায় বিদেশী পর্যটক ও বণিকদের ভ্রমণকাহিনী যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্যতম উৎস তা জানতে পারবেন;*
- *মুঘল যুগের ইতিহাসের উৎস হিসেবে মুদ্রা ও শিলালিপি, স্মৃতিস্তম্ভ এবং অট্টালিকারও যে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তা বলতে পারবেন।*

মধ্যযুগের ভারতবর্ষে মুঘল যুগ ছিল সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চার স্বর্ণযুগ। ইতিহাস চেতনা এ যুগে ব্যাপকতা লাভ করেছিল। ফলে রচিত হয়েছে মুঘল যুগের ধারাবাহিক ইতিহাস সম্বলিত গ্রন্থরাজি। এসব ঐতিহাসিক গ্রন্থের বেশিরভাগের রচয়িতা হলেন রাজসভার ঐতিহাসিকগণ।আর সিংহভাগ রচিত হয়েছে ফারসি ভাষায়। এসব গ্রন্থ রচনায় সরকারি নথিপত্র ও অন্যান্য প্রামাণ্য তথ্য ব্যবহার করার সুযোগও ছিল রাজসভার ঐতিহাসিকদের। মুঘল যুগে রাজসভার ঐতিহাসিক ছাড়াও হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণ স্বতন্ত্রভাবে ভারতের সাধারণ ইতিহাস ও জীবনচরিত রচনা করেছিলেন। ফারসি ভাষায় রচিত এসব গ্রন্থের পরিচয় ইংরেজ ঐতিহাসিক স্যার হেনরি ইলিয়ট ও ডাউসন তাঁদের রচিত History of India as told by its Historians গ্রন্থে (আটখন্ড) বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। মুঘল যুগের গবেষণায় এটি মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে আজও বিবেচিত। মুঘল যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার উপাদানকে পাঁচ ভাগ ভাগ করা যায়– (১) সরকারি দলিলপত্র, (২) সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের ফারসি ভাষায় রচিত ইতিহাস ও সাহিত্য, (৩) বিদেশী বণিক ও পর্যটকদের বিবরণী, (৪) মুদ্রা ও শিলালিপি, (৫) স্মৃতিস্তম্ভ ও অট্টালিকা।

(১) সরকারি দলিলপত্র

মুঘল যুগে সম্রাটদের প্রদত্ত ফরমানসমূহ ঐ যুগের ইতিহাস লেখার অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। মুঘল সম্রাটদের রাজত্বকালে সরকারি দলিলপত্র সংরক্ষণ করার সুবন্দোবস্ত ছিল। পরবর্তীকালে যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে উত্তর ভারতের অধিকাংশ শহর ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত ঐসব দলিলপত্রের অধিকাংশ বিনষ্ট হয়ে গেছে। এ যুগে মূল্যবান গ্রন্থাগার ছিল বলেও প্রমাণ মেলে। শুধুমাত্র সম্রাট আকবরের গ্রন্থাগারে ২৪,০০০ গ্রন্থ ছিল। যার একটিরও হদিস পাওয়া যায়নি। তা সত্ত্বেও মুঘল যুগের বেশ কিছু দলিলপত্র, সরকারি ফরমান, সরকারি কাজে ব্যবহৃত কাগজপত্র পাওয়া গেছে– সেগুলো

থেকে সে যুগের ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এসব সরকারি দলিলপত্রের মধ্যে 'ফরমান' (রাজকীয় আদেশ), 'দস্তুর-উল-আমল' (রাজস্ব-বিধি ও রাজস্ব-পরিসংখ্যান), 'আকভারাৎ-ই-দরবার-ই-মুআল্ল' (দরবারের সংবাদ ও সংবাদ লেখকের প্রতিবেদন), 'ইন্‌সা' অথবা 'মকতুবাত' অথবা 'রূকাৎ' (চিঠিপত্র সংগ্রহ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে মুঘল ইতিহাসে সরকারি আদেশ, সরকারি কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজ এবং চিঠিপত্রের সংকলনে আধুনিক ইতিহাস চর্চার মনস্কতা লক্ষণীয়। উল্লেখিত সরকারি দলিল-দস্তাবেজের কিছু কিছু অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কে.এম. ঝাভেরি সম্পাদিত 'Imperial Farmans' (বোম্বে, ১৯২৮), বি.এল. গোস্বামী ও জে.এস. গ্রোভাল সম্পাদিত 'The Mughuls and the Jogis of Jakhbar', জে.জে.মোদী সম্পাদিত 'The Parsees at the court of Akbar and Dastur Meherji Rana' এবং বিকানীর ডিরেক্টরেট অব আর্কাইভস কর্তৃক ১৯৬২ খ্রি. প্রকাশিত 'A discriptive list of Farmans, Manshurs and Nishans Addressed by Imperial Mughuls to the Princes of Rajasthan' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক উপাত্ত হিসেবে মুঘল যুগের ইতিহাস রচনায় এগুলো এক অমূল্য সম্পদ।

(২) সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের ফারসি ভাষায় রচিত ইতিহাস ও সাহিত্য

মুঘল ভারতের ইতিহাসে উৎস হিসেবে ফারসি ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলির গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে এসব গ্রন্থের পরিচিতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো–

তুজুক-ই-বাবুরী ঃ মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবুরের অনবদ্য সৃষ্টি তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখা 'তুজুক-ই-বাবুরী'। এ গ্রন্থে বাবুরের জীবনের প্রায় সকল ঘটনা এবং ভারতবর্ষ, আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেছেন। তুর্কি ভাষায় রচিত জনপ্রিয় ও ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত এই গ্রন্থ সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপুল মন্তব্য করেছেন, "বাবুরের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ বিলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু তাঁর লিখিত জীবন স্মৃতি আজও অমর ও অক্ষয় হয়ে আছে।" এই গ্রন্থে বাবুরের বৌদ্ধিক সততা, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, সহজাত দক্ষতা এবং উচ্চমানের রুচির পরিচয় মেলে। গ্রন্থটি বাবুরের রাজত্বকাল থেকে হুমায়ুনের প্রথম জীবনের পরিচয় সম্পর্কিত একটি ঐতিহাসিক দলিল। উল্লেখ্য, মুঘল যুগে গ্রন্থটি চারবার ফারসিতে অনুদিত হয়েছিল।

তারিখ-ই-রশিদী ঃ গ্রন্থটি রচনা করেন বাবুরের জ্ঞাতি ভাই মীর্জা মুহাম্মদ হায়দার দুখলাত (১৪৯৯-১৫৫১খ্রি.)। ১৫৫১ খ্রি. রচিত এই গ্রন্থে বাবুর ও হুমায়ুনের রাজত্বকালের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। লেখক নিজে বাবুরের সংগ্রাম, হুমায়ুনের পলায়ন, কাশ্মিরের তৎকালীন জটিল ঘটনাবলির একজন প্রত্যক্ষদর্শী। একমাত্র তিনিই প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে কনৌজ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন তাঁর গ্রন্থে, যা অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে 'তারিখ-ই-রশিদী' গ্রন্থটি হলো 'তুজুক-ই-বাবুরী' গ্রন্থের একমাত্র পরিপূরক। ঐতিহাসিকগণ গ্রন্থটিকে 'a first rate authority' হিসেবে স্থান দিয়েছেন। ১৮৯৫ খ্রি. এন. ইলিয়াস এবং ই. ডেনিসন রস গ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

হবীব-উস-সিয়র ও হুমায়ুননামা ঃ 'তারিখ-ই-রশিদী'র পর মুঘল যুগের ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে খবান্দ আমীর (১৪৭৫-১৫৩৪) রচিত 'হবীব-উস-সিয়র' এবং 'হুমায়ুননামা'র স্থান। 'হবীব-উস-সিয়র' গ্রন্থে বাবুরের রাজত্বকাল এবং হুমায়ুনের প্রথম তিন বৎসরের শাসনকালের পরিচয় পাওয়া যায়। হুমায়ুন নামা হলো 'হবীব-উস-সিয়র' এর শেষ অংশের বিস্তৃতি মাত্র। এই গ্রন্থে হুমায়ুনের রাজত্বকালের প্রথম তিন বৎসরের আনুপূর্বিক বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই গ্রন্থে হুমায়ুনের প্রারম্ভিক সমস্যা এবং তাঁর বিভিন্ন পরিকল্পনার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। এই কারণে গ্রন্থটির তথ্যাবলী প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে পরিগণিত।

আহসন-উস-সিয়র ঃ মীর্জা বার্খওয়াদার তুর্কমান লিখিত আহসন-উস-সিয়র নামক গ্রন্থটি একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। এতে বাবুরের সঙ্গে পারস্যের শাহ ইসমাইলের রাজনৈতিক সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে।

সাইবানীনামা ঃ মুহাম্মদ সালিহ তুর্কি ভাষায় গ্রন্থটি রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে বাবুরের সঙ্গে উজবেক শাসকের রাজনৈতিক সম্পর্কের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

তারিখ-ই-আলমারাই-আব্বাসী ঃ ইসিকন্দার মুনশী ফারসি ভাষায় গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে ষোড়শ শতকে ভারতের সঙ্গে পারস্যের রাজনৈতিক সম্পর্কের বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রন্থটি একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

হুমায়ুননামা ঃ ১৫৮৭ খ্রি. আকবরের নির্দেশে বাবুর কন্যা গুলবদন বেগম (১৫২৩–১৬০৩) গ্রন্থটি রচনা করেন। বাবুর ও হুমায়ুনের ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবন এবং মুঘল হারেমের ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাবুর সম্পর্কিত বিবরণ সংক্ষিপ্ত হলেও হুমায়ুনের সমগ্র জীবনই বিস্তৃতভাবে এতে স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দিক হলো, এতে সে সময়ের সামাজিক রীতিনীতি এবং জনজীবনের প্রতিচ্ছবি অংকিত হয়েছে।

তেজকিরাৎ-উল-ওয়াকিয়াৎ ঃ হুমায়ুনের রাজত্বকালের বিবরণ সম্বলিত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো জৌহর আফতাবচী লিখিত 'তেজকিরাৎ-উল-ওয়াকিয়াৎ'। সম্রাট আকবরের নির্দেশে ১৫৮৭ খ্রি. গ্রন্থটি রচিত হয়। হুমায়ুনের অনুচর এবং প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে লেখক হুমায়ুনের ব্যক্তিগত জীবনের আনুপূর্বিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন এ গ্রন্থে। তবে লেখক যেহেতু ঐতিহাসিক ছিলেন না তাই সাল-তারিখের অপ্রতুলতা এবং স্মৃতি থেকে লেখা বলে ত্রুটি ও অসঙ্গতি লক্ষণীয়। তবুও প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে হুমায়ুনের রাজত্বকাল এবং আকবরের বাল্যজীবন সম্পর্কে রচিত এই গ্রন্থটি এক নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক দলিল।

তারিখ-ই-আকবরশাহী ঃ ১৫৮০ খ্রি. রচিত এ গ্রন্থটি হলো আকবর সম্পর্কিত প্রথম গ্রন্থ। আকবরের রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারি হাজি মুহাম্মদ আরিফ কান্দাহারী এটি রচনা করেছিলেন। আকবরের রাজত্বকালের নির্ভরযোগ্য বিবরণ সম্বলিত এ গ্রন্থে লেখক আকবরের ব্যক্তিত্ব ও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন। বাদায়ুনীর মতো তিনি মৌলবাদী ছিলেন তথাপি তিনি আকবরের ধর্মনীতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু লিখেন নি।

আকবরনামা ঃ মুঘল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক আবুল ফজল সম্রাট আকবরের নির্দেশে তিন খন্ডে 'আকবরনামা' গ্রন্থটি রচনা করেন। আকবরের গুণগ্রাহী হওয়ার সুবাদে উক্ত গ্রন্থে তিনি আকবরকে Superman হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এ কারণে গ্রন্থটির বৈজ্ঞানিক দিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। গ্রন্থটির প্রথম খন্ডে আবুল ফজল তৈমুরের সময় থেকে হুমায়ুনের সময় পর্যন্ড় মুঘল রাজপরিবারের সাধারণ ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ডে বর্ণনা করেছেন আকবরের রাজত্বকালের ঘটনাবলি। তিনি ঘটনা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাবলির পিছনের উদ্দেশ্যও ব্যাখ্যা করেছেন।

আইন-ই-আকবরী ঃ আবুল ফজলের দ্বিতীয় সুবিখ্যাত গ্রন্থ হলো 'আইন-ই-আকবরী'। এটিও তিন খন্ডে রচিত। এ গ্রন্থে আকবরের শাসনামলের ভারতবর্ষের একটি পরিসংখ্যানগত বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রন্থটি বিস্তারিত তথ্যবহুল এবং জ্ঞানকোষ বিশেষ। এতে বিভিন্ন বৃত্তিধারী সমাজের প্রতিটি মানুষের পরিচয় তুলে ধরেছেন লেখক। তবে আকবরের শাসনকার্য বর্ণনায় আকবরকে গৌরবের সকল অধিকার দিতে গিয়ে পূর্ববর্তী সকল মুঘল সম্রাটের অবদানকে ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে– যা পক্ষপাতমূলক। তথাপি ব্লকম্যান জোর দিয়ে বলেছেন, 'আইন-ই-আকবরী হলো ফারসি ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে অদ্বিতীয় গ্রন্থ।'

রূকাৎ-ই-আবুল ফজল ঃ আবুল ফজলের তৃতীয় গ্রন্থ হলো চিঠিপত্র সংকলন বিষয়ক গ্রন্থ 'রূকাৎ-ই-আবুল ফজল'। এই গ্রন্থে লেখক আকবর, মুরাদ, দানিয়েল, মরিয়াম, মাকানি, সেলিম, আকবরের বেগম ও কন্যাগণ সহ লেখকের পিতা-মাতা-ভ্রাতা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের লেখা চিঠি সংকলিত করেছেন। এসব ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র সংকলন করে আবুল ফজল আকবরের শাসনকাল সম্পর্কে নতুন আলোকসম্পাতের সুযোগ করে দিয়েছেন।

ইন্‌সা-ই-আবুল ফজল ঃ আবুল ফজল রচিত এই গ্রন্থের অপর নাম হলো 'মুক্‌তুবাৎ-ই-আল্লামী'। এটিও আকবরের শাসনামলে বিভিন্ন ব্যক্তির লেখা চিঠিপত্র ও সরকারি আদেশ-নির্দেশাদির সংকলন।

তবকাৎ-ই-আকবরী ঃ তিনখন্ডে রচিত এই গ্রন্থটির লেখক হলেন বাবুর ও হুমায়ুনের শাসনামলের উচ্চ রাজকর্মচারী খাজা নিজামউদ্দিন আহম্মদ। গ্রন্থটির প্রথম খন্ডে সুলতানি শাসনামল, দ্বিতীয় খন্ডে মুঘল সম্রাট বাবুর, হুমায়ুন এবং আকবরের শাসনামলের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত আকবরের শাসনকালে গুজরাটের ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি অতীব প্রয়োজনীয়।

মুন্তখব-উৎ-তাওয়ারিক বা তারিখ-ই-বাদায়ুনী ঃ মওলানা আবদুল কাদির বাদায়ুনী তিন খন্ডে এই গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থের প্রথম খন্ডে বাবুর ও হুমায়ুনের রাজত্বকালের বিবরণ, দ্বিতীয় খন্ডে আকবরের রাজত্বকালের আনুপূর্বিক বিবরণ এবং তৃতীয় খন্ডে মুসলিম সাধক ও পন্ডিতদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটির সাল-তারিখ ত্রুটিপূর্ণ এবং ঘটনার বিবরণও অসংঘবদ্ধ। মৌলবাদী এই লেখক ছিলেন আকবরের কট্টর সমালোচক। তাই আবুল ফজল ও মওলানা বাদায়ুনীর লেখা পাশাপাশি খুটিয়ে পড়লে ঐতিহাসিক সত্যটি উদ্‌ঘাটন করতে অসুবিধা হয় না।

তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী ঃ সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিজের লেখা ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে জাহাঙ্গীরের সিংহাসন আরোহণকাল থেকে তাঁর বার বৎসরের রাজত্বকালের ঘটনাবলি বিবৃত হয়েছে। জাহাঙ্গীরের অসুস্থতার কারণে তাঁর রাজত্বের ১৭তম বৎসরে (১৬২২ খ্রি.) লেখায় ছেদ পড়ে। সেই অংশটি (১৬২২–১৬২৪ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভ পর্যন্ত) তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মুতামিদ খান বক্‌শী রচনা করেন। গ্রন্থটিতে জাহাঙ্গীরের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র, তাঁর শাসনকালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি এবং সে যুগের সামরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে পিতার বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহ, খসরুর মৃত্যু এবং নুরজাহানের সঙ্গে তাঁর বিবাহ– এসবের স্থান দেননি তাঁর এই গ্রন্থে।

পাদশাহনামা ঃ ১৬৩৬ খ্রি. আমীন কজ্বিনী সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশে গ্রন্থটি রচনা করেন। 'পাদশাহনামা'য় শাহজাহানের শাসনকালের দশ বছরের ঘটনাবলি তুলে ধরা হয়েছে। একই নামে (পাদশানামা) শাহজাহানের জীবন ও কার্যাবলি এবং প্রথম বিশ বছরের তথ্যবহুল ঘটনাবলি সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করেছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবদুল হামিদ লাহোরি। পরে তাঁর ছাত্র মুহাম্মদ ওয়ারিস শাহজাহানের রাজত্বকালের পূর্ণ ইতিহাস রচনা করেন। তিনি তাঁর গ্রন্থ 'পাদশানামা'য় শাহজাহানের শাসনকালের প্রথম কুড়ি বৎসরের ইতিহাস তাঁর শিক্ষক আবদুল হামিদকে অনুসরণ করে লেখেন। শেষ দশ বছরের ইতিহাস তিনি নিজে স্বাধীনভাবে অপর এক খন্ডে সমাপ্ত করেন।

শাহজাহাননামা ঃ এনায়েত খাঁ রচিত 'শাহজাহাননামা' হলো শাহজাহানের শাসনকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। আওরঙ্গজেবের ক্ষমতা দখল এবং আগ্রা দুর্গ অধিকারের ঘটনাবলি এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া মুহাম্মদ শালিহ কম্বু লিখিত 'অমল-ই-শালিহ' এবং মুহাম্মদ সাদিক খানের রচিত 'শাহজাহাননামা' গ্রন্থ দু'টি শাহজাহানের রাজত্বকালের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

আলমগীরনামা ঃ মীর্জা মুহাম্মদ কাজিম রচিত 'আলমগীরনামা' গ্রন্থটিতে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের প্রথম দশ বৎসরের নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বিবরণ বিবৃত হয়েছে। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ গ্রন্থটিকে আওরঙ্গজেবের শাসনকালের 'first rate authority' হিসেবে বিবেচনা করেন।

মসির-ই-আলমগীরী ঃ এই গ্রন্থটি মুহাম্মদ সাকি মুস্‌ড়াইদ খান রচনা করেন। সরকারি তথ্যের ওপর ভিত্তি করে লেখা এই গ্রন্থে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়।

এছাড়া আকীল খান রচিত 'জাফরনামা-ই-আলমগীরী' মুহাম্মদ হাসিম কাফী খান রচিত 'মন্তখাব-উল-গুলাব' এবং আওরঙ্গজেবের নিজের লেখা 'রূকাইৎ-ই-আলমগীরী' আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

(৩) বিদেশী বণিক ও পর্যটকদের বিবরণী

মুঘল যুগে ভ্রমণ পিপাসু ইউরোপীয়রা ব্যাপকভাবে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। কেউ এসেছেন ব্যবসা করতে, কেউবা এসেছিলেন ভারত ভ্রমণে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই রেখে গেছেন তাঁদের ভারত ভ্রমণের লিখিত বিবরণ। এসব বিবরণে মুঘল যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক অবস্থার এক তথ্যবহুল চিত্র পাওয়া যায়। স্বভাবতই বিদেশী বণিক ও পর্যটকদের এসব লিখিত বিবরণ সে যুগের ঐতিহাসিক দলিল। এঁরা যা দেখেছেন বা শুনেছেন তা লিখেছেন। ফলে এসব বিবরণীতে বহু ত্রুটিও লক্ষ্য করা যায়। তথাপি এসবের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

রাল্‌ফ ফিচ্‌ ঃ সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের মাঝামাঝি সময়কালে (১৫৮৩–১৫৯১) রাল্‌ফ ফিচ্‌ (ইংরেজ) ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়ান। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে ভারতের বিভিন্ন খাদ্যশস্য, সুতীবস্ত্র এবং জনজীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর প্রাচুর্যের কথা তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি দিউ, আগ্রা, বাংলাদেশ, পেগু, দক্ষিণ-ভারত ও সিংহলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন। আর সে সমস্ত অঞ্চলের মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করেছেন।

উইলিয়াম হকিন্স ঃ সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বহু ইউরোপীয় ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উইলিয়াম হকিন্স উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৬০৮ খ্রি. ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের পত্র নিয়ে রাজদরবারে উপস্থিত হলে জাহাঙ্গীর তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। এক সময়ে তিনি জাহাঙ্গীরের বন্ধুতে পরিণত হন। তিনি ১৬১১ খ্রি. পর্যন্ত ভারতবর্ষে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে তিনি জাহাঙ্গীরের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে এক জীবন্ত চিত্র তুলে ধরেন।

এডওয়ার্ড ঃ ১৬১৫ খ্রি. রাজা প্রথম জেমসের চিঠি নিয়ে এডওয়ার্ড জাহাঙ্গীরের দরবারে এসেছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ বিবরণীতে জাহাঙ্গীরের রাজদরবারের যেসব ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে সেই সময়ের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

স্যার টমাস রো ঃ তিনিও রাজা প্রথম জেমসের দূত হিসেবে জাহাঙ্গীরের দরবারে আগমন করেন। তিনি মুঘল রাজদরবারের ঐশ্বর্য দেখে অভিভূত হন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে মুঘল রাজদরবারের দলীয় ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার নির্ভরযোগ্য ও তথ্যবহুল বিবরণী পাওয়া যায়।

পিয়েত্রে দেল্লা ভালে- ঃ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ১৬২৩ খ্রি. ইতালীয় পর্যটক পিয়েত্রে দেল্লা ভালে- সুরাটে আগমন করেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ বিবরণীতে ধর্মীয় সহনশীলতার সঙ্গে গুজরাটে নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথার অবনয়নের কথা তুলে ধরেছেন।

এফ পেলসারেত ঃ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে আগত ডাচ্‌ পরিব্রাজক এফ পেলসারেত কর্তৃক রচিত 'জাহাঙ্গীরের ভারত' মুঘল যুগের ইতিহাস রচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

ডে-লায়েট ঃ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের অন্য একজন গুরুত্বপূর্ণ পরিভ্রাজক হলেন ডে-লায়েট। তিনি তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে জাহাঙ্গীরের ব্যক্তিগত জীবন, তাঁর রাজত্বকালের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে নুরজাহানের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের বিবাহের কথা তিনি বর্ণনা করেছেন– যা জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেন নি।

ব্রুটন ও কার্টরাইট ঃ শাহজাহানের রাজত্বকালে যে কয়জন পরিব্রাজক ভারতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ব্রুটন ও কার্টরাইট নামক দু'জন ইউরোপীয় ব্যবসায়ীর নাম পাওয়া যায়। তাঁরা ১৬৩২ খ্রি. বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।

ট্যাভার্নিয়ে ঃ ফরাসি পর্যটক ট্যাভার্নিয়ের ভ্রমণ বৃত্তান্তে মুঘল যুগের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি রয়েছে। তিনি ১৬৪০–১৬৬৭ খ্রি. পর্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত মুঘল ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

বার্নিয়ে ঃ ফরাসি চিকিৎসক বার্নিয়ে ভারতবর্ষে ১৫৫৬–১৫৬৭ খ্রি. পর্যন্ত ছিলেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে মুঘল প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে। তাঁর বিস্তৃত ও মূল্যবান ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলো ফ্রান্সের অর্থমন্ত্রী মঁসিয়ে কলেবরকে লেখা একটি দীর্ঘ চিঠি। এ চিঠিতে তিনি তৎকালীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার একটি নিখুঁত ছবি চিত্রিত করেছেন।

মানুচি ঃ ট্যাভার্নিয়ে ও বার্নিয়ে ছাড়াও আওরঙ্গজেবের শাসনকালে যে গুরুত্বপূর্ণ ইউরোপীয় পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আসেন তিনি হলেন ইতালীয় পরিব্রাজক মানুচি। মানুচি ১৬৫৩–১৭০৮ খ্রি. পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ভারতবর্ষে অবস্থান করেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত 'Stories do mogor' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

(৪) মুদ্রা ও শিলালিপি

মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় মুদ্রা ও শিলালিপি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মুঘল আমলের মুদ্রাগুলো একদিকে যেমন সে যুগের মুদ্রানীতির পরিচয় বহন করে, অন্যদিকে ধাতুশিল্পেরও পরিচয় পাওয়া যায়। যেকোন যুগের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা জানতে মুদ্রা সহায়ক উপাদান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির তারিখ নির্ধারণে মুদ্রা অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত। মুঘল যুগে পাথর অথবা তাম্রপাত্রের ওপর বিভিন্ন অনুশাসন লিপি লেখার প্রচলন ছিল। মুঘল যুগের ঐতিহাসিক ঘটনাবলির তারিখ নির্ধারণে অন্যতম উপাদান হিসেবে এসব অনুশাসন লিপি ব্যবহার করা যায়।

(৫) স্মৃতিস্তম্ভ ও অট্টালিকা

মুঘল যুগের স্থাপত্য শিল্পের প্রচুর নিদর্শন বর্তমানেও বিদ্যমান। এসব স্মৃতিস্তম্ভ ও অট্টালিকা সেই যুগের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার আলোকপাত করতে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যায়। মুঘল সম্রাটগণ কর্তৃক নির্মিত স্থাপত্যসমূহে তাঁদের উন্নত রুচিবোধ লক্ষ্য করা যায়।

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন প্রকার উপাদান সন্নিবেশিত করার মাধ্যমে ইতিহাস লিখিত হয়। মুঘল যুগের ইতিহাস লিখনে পাঁচটি ধারার উপাদান পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ঃ (১) সরকারি দলিলপত্র ও (২) সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের ফারসি ভাষায় রচিত ইতিহাস ও সাহিত্য, (৩) বিদেশী বণিক ও পর্যটকদের বিবরণী। চতুর্থ ও পঞ্চম ধারার উপাদান হচ্ছে যথাক্রমে মুদ্রা ও শিলালিপি এবং মুঘল যুগে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ ও অট্টালিকা। এসব উপাদানের ওপর ভিত্তি করে ভারতে মুঘল যুগের ইতিহাস রচিত হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. Jagadish Narayan Sarkar, *History of History writing in Medieval India,* Calcutta, 1977.
২. এ. কে. এম. আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৭৩।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আকবরের লাইব্রেরিতে গ্রন্থসংখ্যা কত ছিল?
(ক) ২৫,০০০ (খ) ২৩,০০০
(গ) ২৪,০০০ (ঘ) ২৮,০০০।

২। 'তুজুক-ই-বাবুরী'র লেখক কে?
(ক) হুমায়ুন (খ) শেরশাহ
(গ) বাবুর (ঘ) শাহজাহান।

৩। তারিখ-ই-রশিদী' কে রচনা করেন?
(ক) মীর্জা মুহাম্মদ কাজিম (খ) আবুল ফজল
(গ) মীর্জা মুহাম্মদ হায়দার দুখলাত (ঘ) মীর্জা বার্খওয়াদার তুর্কমান।

৪। আকবরের আমলে কোন ইউরোপীয় পর্যটক ভারতে এসেছিলেন?
(ক) উইলিয়াম হকিন্স (খ) স্যার টমাস রো
(গ) রাল্‌ফ ফিচ্‌ (ঘ) এডওয়ার্ড।

৫। ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ে কত সময় ভারতে ছিলেন?
(ক) ১৫৫৬-১৫৬৭ খ্রি. পর্যন্ত (খ) ১৫৬৬–১৫৬৭ খ্রি. পর্যন্ত
(গ) ১৫৬৭–১৫৬৮ খ্রি. পর্যন্ত (ঘ) ১৫৬৮–১৫৬৯ খ্রি. পর্যন্ত।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। তুজুক-ই-বাবুরী গ্রন্থের বিষয়বস্তু উল্লেখ করুন।
২। তারিখ-ই-রশিদীর ওপর একটি টীকা লিখুন।
৩। আবুল ফজল লিখিত দু'টি গ্রন্থের বিবরণ দিন।
৪। জাহাঙ্গীরের দরবারে আগত দু'জন ইউরোপীয় দূত সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।
৫। মধ্যযুগের ভারত ইতিহাস রচনায় মুদ্রা ও শিলালিপির ভূমিকা নিরূপন করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। মুঘল যুগের ইতিহাস রচনায় সরকারি দলিলপত্র ও সমকালীন ঐতিহাসিকদের রচিত গ্রন্থের ভূমিকা পর্যালোচনা করুন।
২। মুঘল যুগের ইতিহাসের উৎসের একটি বিবরণ দিন।

পাঠ - ২

বাবুর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবুরের বংশ পরিচয়, ফরগনার সিংহাসন আরোহন, সমরখন্দ অধিকার ও হস্তচ্যুতি, সমরখন্দ পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা এবং ফরগনা থেকে বিতাড়িত হবার ঘটনাবলি জানতে পারবেন;*
- *বাবুরের ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা, অভিযানকালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা এবং ভারত অভিযানের প্রাথমিক ঘটনাবলি বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহের বিবরণসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন;*
- *বিজেতা, শাসক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে বাবুরের কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *বাবুরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।*

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবুর কর্তৃক ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। দিল্লির সুলতানি শাসনের পতনের যুগে পরাক্রমশালী কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা আত্মপ্রকাশ করেছিল। সমরকুশলী মুঘল নেতা বাবুর বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজশক্তিকে অবদমিত করে পুনরায় পরাক্রমশালী কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেন।

বাবুর ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন মধ্য এশিয়ার দুই পরাক্রমশালী বীরের বংশধর। পিতৃকূলের দিকে তৈমুর লঙ্গ এবং মাতৃকূলের দিকে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খাঁ ছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ। স্বভাবতই বাবুরের রক্তে শৌর্য-বীর্য, পরাক্রম ও দুঃসাহসিক অভিযানপ্রিয়তা ছিল সহজাত। বাবুরের পিতা ওমর শেখ মীর্জা ছিলেন মধ্য এশিয়ার (বর্তমান রুশ তুর্কিস্থানের অন্তর্গত) ক্ষুদ্র ফরগনা রাজ্যের অধিপতি। তিনি এই ক্ষুদ্র রাজ্য নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারণ তাঁর বড়ভাই আহমদ মীর্জা তৈমুর লঙ্গের রাজধানী সমরখন্দ ও বুখারাসহ সম্পদশালী অঞ্চলগুলো অধিকার করেছিলেন। ওমর শেখ মীর্জাও ফরগনা রাজ্যের উত্তর দিকে অবস্থিত আখশী দুর্গের অধিকার নিয়ে বড় ভাইয়ের সঙ্গে এক পারিবারিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এমনি পরিস্থিতিতে উড়ন্ত পায়রার সৌন্দর্য দেখতে গিয়ে বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে বাবুর মাত্র এগার বছর বয়সে ফরগনা রাজ্যের অধিপতি হন। সিংহাসনে বসে বাবুর প্রথম থেকেই তাঁর পূর্বপুরুষ তৈমুরের মতো বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন এবং তাঁর রাজধানী সমরখন্দ অধিকারের পরিকল্পনা করেন। বাবুরের আত্মীয়-স্বজনের বিরোধিতা সর্বোপরি জ্ঞাতি উজবেক নেতা সাইবানি খানের বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৪৯৭ খ্রি. তিনি সমরখন্দ অধিকার করেন। শীঘ্রই স্বরাজ্য ফরগনার ষড়যন্ত্রের সংবাদ পেয়ে বাবুর সমরখন্দ পরিত্যাগ করলে সাইবানি সমরখন্দ অধিকার করেন। বাবুর পুনরায় ১৫০১ খ্রিঃ সমরখন্দ আক্রমণ করেন, কিন্তু সাইবানির নিকট পরাজিত হয়ে তাঁকে সমরখন্দ অধিকারের আশা চিরতরে ত্যাগ করতে হয়। শুধু তাই নয়, এই সময় তাঁর জ্ঞাতি মীর্জা গোষ্ঠীর সর্দারদের চক্রান্তে ফরগনার সিংহাসন থেকে বিতাড়িত হন। ফলে বাবুর নিরাশ্রয় ও সম্বলহীন অবস্থায় ভাগ্য-বিড়ম্বিত হয়ে যাযাবর জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হন। বাবুর এই দুর্দিনে তাসক্লেন্ট (বর্তমান রাশিয়া)-এ তাঁর মামা সুলতান মাহমুদ খানের আশ্রয়ে আসেন। তাঁর দুই মামা মাহমুদ খান ও আহমদ খানের সাহায্যে ফরগনা রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৫০৩ খ্রি. আর্চিয়ান-এর যুদ্ধে সাইবানি

খানের কাছে পরাজিত হয়ে চিরতরে পিতৃরাজ্য ফরগনা উদ্ধারের স্বপ্ন ত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিক্রম করে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপনে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন।

১৫০৪ খ্রি. বাবুর উজবেক শাসনের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহের সুযোগে কাবুল অধিকার করেন এবং 'পাদশাহ' (বাদশাহ) উপাধি ধারণ করে সেখানে রাজ্য স্থাপন করেন। কাবুলে ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর বাবুর পুনরায় সমরখন্দ অধিকার করার জন্য পারস্যের শাহ ইসমাইলের সাহায্যপ্রাপ্ত হন। তাঁর সহায়তায় ১৫১১ খ্রি. বাবুর সমরখন্দ অধিকার করেন। কিন্তু ১৫১২ খ্রি. সাইবানির পুত্রের কাছে বাবুর পরাজিত হলে সমরখন্দ পুনরায় তাঁর হস্তচ্যুত হয়। এইভাবে বার বার সমরখন্দ বিজয়ে ব্যর্থ হয়ে তিনি ভারত বিজয়ের দিকে মনোনিবেশ করেন। তখন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা বাবুরের ভারত আক্রমণের অনুকূল ছিল। এ সময় ভারতে সার্বভৌম কেন্দ্রীয় শক্তি বলে কিছুই ছিল না। দিল্লির লোদি বংশীয় সুলতানি শাসন দিল্লি ও তাঁর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। উত্তর ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলই কার্যত স্বাধীন হয়ে পড়েছিল। এইসব অঞ্চলে বিভিন্ন আফগান শাসকগণ শাসন করছিলেন। রাজপুতনাও এই সময়ে কার্যত স্বাধীন। মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহও কেন্দ্রীয় আফগান শক্তির দুর্বলতার সুযোগে ভারতে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখছিলেন।

১৫১৯ খ্রি. বাবুর এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারত অভিযানের উদ্দেশ্যে বাজাউর ও সোয়াতের দিকে অগ্রসর হন এবং ঝিলাম নদীর পশ্চিম তীরে ভিরা নগরীতে উপস্থিত হন। এই সময়ে বাবুর দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদির নিকট এক দূত পাঠিয়ে তৈমুরের উত্তরাধিকারী হিসাবে তৈমুরের বিজিত অঞ্চলগুলো দাবি করেন। কিন্তু বাবুরের দূতকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদি আটক করেন। পাঁচ মাস পর তাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বাবুরও ভীর, খুসব এবং চন্দ্রবতী নদীর তীরস্থ এলাকা জয় করে কাবুলে ফিরে যান। ১৫২০ খ্রি. বাদাকশান দখল করে স্বীয় পুত্র হুমায়ুনের নিকট শাসনভার অর্পণ করেন। ১৫২২ খ্রি. তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ স্থান কান্দাহার অধিকার করে দ্বিতীয় পুত্র কামরানকে এর শাসনের দায়িত্ব দেন।

উল্লেখ্য, লোদি বংশীয় সুলতানগণের অধীনে দিল্লি সাম্রাজ্য পাঞ্জাব থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু লোদি সাম্রাজ্য ছিল কতগুলো স্বাধীন রাজ্যের সমষ্টিমাত্র– তাদের মধ্যে কোন সংহতি ছিল না। সুলতান ইব্রাহিম লোদির স্বেচ্ছাচারিতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের ফলে কয়েকজন ওমরাহ সুলতানের প্রতি প্রতিশোধ পরায়ণ হন। উপরন্তু পাঞ্জাবের গভর্নর দৌলত খান লোদির পুত্র দিলওয়ার খানের প্রতি ইব্রাহিম লোদির নিষ্ঠুর আচরণ লোদি অভিজাতদের ক্ষিপ্ত করে তোলে।এই পরিস্থিতিতে দৌলত খান লোদি ও দিল্লির সিংহাসনের অন্যতম দাবিদার আলম খান কাবুলের অধিপতি বাবুরকে ভারত আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। দৌলত খান আশা করেছিলেন যে, ইব্রাহিম লোদির অপদার্থতা এবং দিল্লি সুলতানির অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগে বাবুরের সহায়তায় নিজ ক্ষমতা বিস্তার করবেন। বাবুর কালবিলম্ব না করে দৌলত খান লোদির আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এবং ১৫২৪ খ্রি. সসৈন্যে সিন্ধু, ঝিলাম ও চেনাব নদী অতিক্রম করে লাহোর অধিকার করেন। এতে দৌলত খান ও আলম খান অসন্তুষ্ট হন। তাঁরা দেখতে পেলেন সাহায্যকারী মিত্র হিসেবে আমন্ত্রণ করে ভারতে এক নতুন প্রভু ডেকে আনলেন। স্বভাবতই দৌলত খান ও আলম খান বিরুদ্ধাচরণ শুরু করলেন। বাবুর এরূপ পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে নতুন শক্তি সংগ্রহের জন্য পুনরায় কাবুলে ফিরে যান এবং দিল্লির সুলতানি শাসনে শেষ আঘাত হানার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

১৫২৫ খ্রি. নভেম্বর মাসে বাবুর কাবুল থেকে পুনরায় ভারত অভিযানে বের হন। বাদাকশান থেকে হুমায়ুন এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী নিয়ে পথিমধ্যে পিতার সঙ্গে যোগ দেন। দৌলত খান লোদিকে এবার সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে বাবুর পাঞ্জাব অধিকার করেন। অত:পর তিনি দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করে ১৫২৬ খ্রি. ১২ এপ্রিল পানিপথের প্রান্তরে এসে উপস্থিত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য সমাবেশ করেন। ইব্রাহিম লোদিও তাঁর বাহিনী নিয়ে কয়েক মাইল ব্যবধানে পানিপথে ঘাঁটি স্থাপন করেন। বাবুরের আত্মজীবনীর তথ্য মতে তাঁর সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র বার হাজার। এসঙ্গে ছিল উস্তাদ আলি ও মুস্তফার নেতৃত্বাধীন একটি সুসজ্জিত গোলন্দাজ বাহিনী। অন্যদিকে ইব্রাহিম লোদির সৈন্য বাহিনীতে এক লক্ষ পদাতিক ও এক হাজার

হস্তি ছিল। উভয় বাহিনী ১২ এপ্রিল থেকে ১৯ এপ্রিল আটদিন শুধু দাঁড়িয়ে রইল। ২০ এপ্রিল হঠাৎ এক রাতে বাবুর চার পাঁচ হাজার সৈন্যকে শত্রু শিবির আক্রমণের নির্দেশ দেন। যদিও সৈন্যদের অবহেলায় এ অভিযান ব্যর্থ হয়। কিন্তু ইব্রাহিম লোদি এই আক্রমণে প্ররোচিত হয়ে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে শত্রু শিবিরের দিকে অগ্রসর হতে আদশে দেন। সঙ্গে সঙ্গে বাবুরও ইব্রাহিম লোদির সৈন্যবাহিনী মোকাবেলা করতে অগ্রসর হন। পানিপথের ঐতিহাসিক রণক্ষেত্রে ১৫২৬ খ্রি. ২১ এপ্রিল সকাল ৯টায় বাবুরের সৈন্যবাহিনী আফগান অধিপতি ইব্রাহিম লোদির সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি হন। এই যুদ্ধে বাবুর প্রথমবারের মতো কামান ব্যবহার করেন। বাবুরের প্রতিপক্ষ ইব্রাহিম লোদির সৈন্যসংখ্যা বেশি হলেও তাঁদের মধ্যে সামরিক শৃঙ্খলা ও অভিজ্ঞতার যেমন অভাব ছিল তেমনি কোন যোগ্য সেনাপতি দ্বারা যুদ্ধ পরিচালিত হয়নি। তাছাড়া ইব্রাহিম লোদির কোন কামান-বন্দুক ছিল না। শত্রুপক্ষের এসব দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে বাবুর স্বীয় সৈন্যবাহিনীকে সুকৌশলে পরিচালিত করেন। তিনি শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে কামান থেকে গোলা ছুঁড়তে নির্দেশ দেন। বাবুরের গোলন্দাজ বাহিনী ও সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের মুখে ইব্রাহিম লোদির সৈন্যবাহিনী দাঁড়াতে পারেনি। ঐদিন দুপুরের মধ্যে ইব্রাহিম লোদির হাজার হাজার সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন। আর স্বয়ং ইব্রাহিম লোদি বীরের মতো লড়াই করে মৃত্যুবরণ করেন। অতপর বাবুর পানিপথের রণক্ষেত্র থেকে অগ্রসর হয়ে দিল্লি ও আগ্রা দখল করেন এবং নিজেকে ভারতের বাদশা হিসেবে ঘোষণা করেন। পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদির পরাজয়ের ফলে লোদি বংশের শাসনের অবসান ঘটে এবং দিল্লি সুলতানির স্থলে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এটি পানিপথের প্রথম যুদ্ধ নামে খ্যাত।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে পানিপথের এই যুদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ যুদ্ধ জয়ের ফলে দিল্লি ও আগ্রা বাবুরের অধিকারে আসে। ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ যথার্থই বলেছেন, "The battle of Panipath placed the empire of Delhi in Babur's hand. The power of the Lodi dynasty was shattered to pieces, and the sovereignty of Hindustan passed to the Chaghtai Turks." (পানিপথের যুদ্ধ দিল্লি সাম্রাজ্যকে বাবুরের হাতে অর্পণ করে। লোদি বংশের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ হয়ে যায় এবং হিন্দুস্তানের সার্বভৌমত্ব চাঘতাই তুর্কিদের অধীনে আসে।)

বাবুর দিল্লি ও আগ্রার অধিপতি হলেও ভারতবর্ষের এমন কি উত্তর ভারতের বিরাট এলাকা তাঁর অধিকারের বাইরে ছিল। সমগ্র দেশে আফগান আমীর ও জায়গীরদারগণের কর্তৃত্ব তখনও অক্ষুন্ন ছিল। তাঁদের পরাজিত না করা পর্যন্ত দিল্লির সিংহাসন নিরাপদ ছিল না। তাই প্রথমেই তিনি দিল্লি সুরক্ষার জন্য দিল্লি ও আগ্রার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বিয়ানা, গোয়ালিয়র, ধোলপুর, কালপি, জৌনপুর, গাজীপুর প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করেন।

পানিপথের যুদ্ধ বিজয়ী বাবুরের পক্ষে সমগ্র ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার করা সহজ ছিল না। একদিকে যেমন সুলতানি আমলের আফগান জায়গীরদার ও আফগান দলনেতাগণ বাবুরকে সুনজরে দেখেননি, তেমনি অন্যদিকে মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহ তাঁর দিল্লি অধিকার পরিকল্পনায় বাবুরকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে বিবেচনা করতে লাগলেন। উল্লেখ্য, বাবুর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, রানা সংগ্রাম সিংহ কাবুলে দূত পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, বাবুর দিল্লি আক্রমণ করলে রানা সংগ্রাম সিংহও একই সময়ে আগ্রার দিকে আক্রমণ পরিচালনা করবেন। কিন্তু সংগ্রাম সিংহ তাঁর কথা রাখেননি। তাই বাবুরও যে রানা সংগ্রাম সিংহের বিরোধিতার সম্মুখীন হবেন তা বুঝতে পেরেছিলেন। সংগ্রাম সিংহ মনে করেছিলেন বাবুর তাঁর পূর্বপুরুষ তৈমুরের মতো দিল্লি লুণ্ঠন করে কাবুলে ফিরে যাবেন। কিন্তু বাবুরের ভারত ত্যাগের ইচ্ছা নেই দেখে রানা সংগ্রাম সিংহ বাবুরকে ভারত থেকে বিতাড়িত করতে আট লক্ষ সৈন্য ও পাঁচশত যুদ্ধহস্তি সহ বাবুরের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হন। রানা সংগ্রাম সিংহ ও মেওয়াটের হাসান খাঁর সম্মিলিত বাহিনী বাবুর অধিকৃত বিয়ানা অধিকার করেন। ১৫২৭ খ্রি. ১১ ফেব্রুয়ারি বাবুর উল্লেখিত বাহিনীর বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠান। কিন্তু রাজপুত ও আফগান সৈন্যদের কাছে বাবুরের সৈন্যগণ পরাজিত হন। অন্যদিকে আফগানগণ রাপ্রি এবং চান্দয়ার অধিকার করেন। তাছাড়া ইতোমধ্যে বাবুর অধিকৃত সম্বল, কনৌজ ও গোয়ালিয়রেরও পতন ঘটে। চান্দেরী, অম্বর, মাড়োয়ার, আজমীর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি অঞ্চলের শাসকগণ এবং বহুসংখ্যক রাজপুত দলপতি,

মেওয়াটের হাসান খাঁ এবং সুলতান সিকান্দর লোদির পুত্র মাহমুদ লোদি রানা সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে যোগ দিয়ে সম্মিলিত আফগান ও রাজপুত বাহিনী গঠন করে। এরূপ সংকটময় পরিস্থিতিতে বাবুর স্বয়ং পানিপথের যুদ্ধে সেনাবাহিনী পরিচালনায় যে কৌশল নিয়েছিলেন সেই একই কৌশলে ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মার্চ তিনি আগ্রা থেকে সাইত্রিশ মাইল পশ্চিমে খানুয়ার নামক স্থানে সম্মিলিত আফগান ও রাজপুত বাহিনীর মোকাবেলায় অগ্রসর হন। শত্রুদের বিশাল সম্মিলিত বাহিনীর সামনে বাবুরের সৈন্যবাহিনী ভয়ে ও হতাশায় উদ্যমহীন হয়ে পড়ে। বাবুর নিজেও খানুয়ার যুদ্ধের ভয়াবহতা উপলব্ধি করেন। কিন্তু বিপদে নির্ভীকচিত্ত বাবুর তাঁর সৈন্যদের চিত্তে প্রেরণা দানের উদ্দেশ্যে উদাত্তকণ্ঠে আল্লাহ্‌র নামে যুদ্ধে জয়লাভ অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হতে আহ্বান জানান। তাঁর এই আহ্বানে সৈন্যগণ অনুপ্রাণিত হয় এবং যুদ্ধে জয়লাভ অথবা শহীদ হতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এখানেও বাবুর পানিপথের অনুরূপ সৈন্য সংস্থাপনের ব্যবস্থা করেন। বাবুর নিজে উস্তাদ আলি ও মুস্তফার নেতৃত্বে অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে গোলন্দাজ বাহিনীর কামান ব্যবহার করলে রানা সংগ্রাম সিংহের বিশাল বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এই যুদ্ধে রাজপুত বাহিনী প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করেও পরাজিত হয়। মেওয়াটের হাসান খাঁ ও দুঙ্গরপুরের রাওয়াল উদয় সিংহ সহ বহু সেনাপতি নিহত হন। রানা সংগ্রাম সিংহ কোন রকমে প্রাণ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন এবং দুই বছর পর ভগ্ন হৃদয়ে মৃত্যুবরণ করেন। খানুয়ার যুদ্ধে ভারতে বাবুরের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী রাজপুত শক্তি সম্পূর্ণভাবে পরাজয় বরণ করে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে খানুয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব সমধিক। প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধের ফলাফল পানিপথের যুদ্ধের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। পানিপথের যুদ্ধে শুধু ইব্রাহিম লোদি পরাজিত হয়েছিলেন, কিন্তু খানুয়ার যুদ্ধে সম্মিলিত রাজপুত শক্তির পরাজয়ের ফলে সমগ্র ভারতে মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সর্বাপেক্ষা গুরুতর বাধা দূর হয়। ভারতে রাজপুত জাতির রাজনৈতিক পুনরুত্থানের সুযোগ বিনষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে, পানিপথে ভারতে মুঘল বিজয়ের যে সূচনা হয়েছিল, খানুয়ায় তা সম্পূর্ণ হয়। এই যুদ্ধের পর থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক কেন্দ্র কাবুল থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর হয়। খানুয়ার যুদ্ধকেই বাবুরের শেষ আত্মরক্ষার যুদ্ধ বলা যায়। কারণ, এই যুদ্ধের পর বাবুরের দিল্লির সিংহাসন চ্যুতির আর কোন সংশয় রইল না। পরবর্তীকালে বাবুর যেসব যুদ্ধ করেছিলেন, সেগুলো ছিল সাম্রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধ।

বাবুর খানুয়ার যুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ এপ্রিল মেওয়াটের রাজধানী আলোয়ার অধিকার করেন। ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথমদিকে বাবুর মেদিনী রায়কে পরাজিত করে চান্দেরী দুর্গ মুঘল অধিকারে আনেন। ঐ বৎসর ফেব্রুয়ারিতে আফগানগণ বিবনের নেতৃত্বে অযোধ্যা ও লক্ষ্ণৌ থেকে মুঘলদের উচ্ছেদ করে। পরের মাসেই বাবুর কনৌজ পৌঁছে সেখান থেকে গঙ্গা নদী পার হন এবং আফগানদের পরাজিত করে অযোধ্যা নিজ অধিকারে নিয়ে আসেন। বিবন বাংলায় পলায়ন করেন।

এরপর বাবুর বিহার ও বাংলার আফগান শক্তিকে উৎখাত করতে মনোনিবেশ করেন। ইব্রাহিম লোদির ভ্রাতা মাহমুদ লোদি বিহার অধিকার করেন। বিহার থেকে কনৌজ পর্যন্ত এলাকার আফগানগণ তাঁর সাথে যোগদান করে বাবুরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে একতাবদ্ধ হন। এ সংবাদ জানতে পেরে বাবুর পুত্র আসকারীকে মাহমুদ লোদির বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং নিজে সৈন্যবাহিনী নিয়ে পূর্বদিকে এগুতে থাকেন। বাবুরের আগমনের কথা জানতে পেরে আফগান সেনা প্রধানগণ একে একে মাহমুদ লোদির পক্ষ ত্যাগ করেন। ফলে মাহমুদ লোদির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। বাবুর এলাহাবাদ, চুনার এবং বারাণসী হয়ে বক্সারের দিকে এগুতে থাকেন। এ সময়ে অনেক আফগান নেতা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে। শের খান এবং মাহমুদ লোদি বাংলার সুলতান নসরত শাহের কাছে আশ্রয় নেন। আফগান বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য বাবুর আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হন এবং ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে পাটনার নিকটবর্তী গোগরা নামক স্থানে মাহমুদ লোদির নেতৃত্বে গঠিত আফগানদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন। এটি বাবুরের শেষ বৃহত্তম যুদ্ধ। বিহারের শাসক জালাল খাঁ বাবুরের অধীনতা স্বীকার করেন। এ সময়ে সুলতান নসরত শাহ বাবুরের সাথে কোন বিবাদে না গিয়ে দূত পাঠিয়ে সন্ধি স্থাপন করেন এবং বিহারের ওপর বাবুরের কর্তৃত্ব

মেনে নেন। ফলস্বরূপ বাবুরও একরকম বঙ্গদেশের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেন। এভাবে তিনটি যুদ্ধ দ্বারা তাঁর সাম্রাজ্য কাবুল থেকে গোগরা এবং হিমালয় থেকে গোয়ালিয়র পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

বাবুর তাঁর ভারত বিজয়ের ফল বেশিদিন ভোগ করতে পারেননি। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে মুঘল সাম্রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা পরলোকগমন করেন। বাবুরকে প্রথমদিকে আগ্রার কাছে আরামবাগে সমাহিত করা হয় কিন্তু কয়েক বছর পর তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী কাবুলে তাঁর এক প্রিয় উদ্যানে সমাহিত করা হয়।

বাবুরের কৃতিত্ব

মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসে জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবুরের স্থান নির্ণয় কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। বাবুর শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র মধ্যযুগের ইতিহাসে এক রোমান্টিক ও হৃদয়গ্রাহী ব্যক্তিত্ব। ঐতিহাসিকগণ তাঁর কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে গিয়ে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। সমসাময়িক ও আধুনিক ইতিহাসবিদগণ একমত যে, "Babar was one of the most brilliant monarchs of medieval history." ভিনসেন্ট স্মিথ মন্তব্য করেন, "তাঁর যুগে বাবুর ছিলেন এশিয়ার নরপতিদের মধ্যে সব থেকে প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তি এবং ভারতীয় নরপতিদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী।" রাসব্রুক উইলিয়াম বলেন, বাবুর "ষোড়শ শতাব্দীর একজন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা।" তিনি তাঁর চরিত্রে আটটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন, যথা– বিচক্ষণতা, মহান উচ্চাশা, যুদ্ধ-নিপুণতা, সুদক্ষ শাসনকৌশল, প্রজা-হিতৈষণা, উদার প্রশাসনিক আদর্শ, সৈনিকদের হৃদয় জয়ের ক্ষমতা ও ন্যায় বিচার প্রবণতা।

বাবুর ছিলেন একজন নির্ভীক সৈনিক, সেনাপতি, সুদক্ষ অস্ত্র পরিচালক ও অশ্বারোহী এবং একজন দুর্ধর্ষ শিকারী। বাবুরের মাঝে তুর্কি জাতির সাহস ও কর্মদক্ষতার সঙ্গে মোঙ্গলদের তেজস্বিতা ও সমরনিপুণতার সমন্বয় ঘটেছিল। এ কারণে ভারত অভিযানে তিনি কখনো বিপর্যস্ত হননি। তিন তিনটি যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার গৌরব অর্জন করেছিলেন। একটানা যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে দিয়ে কাবুল থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ উত্তর ভারতের এলাকাসমূহের অধিশ্বররূপে চার বৎসর রাজত্বকালে সুষ্ঠু প্রশাসনিক কাঠামো, আইনকানুন, শাসনক্ষেত্রে কোন নতুন সংগঠনও গড়ে তুলতে পারেননি। তবে তিনি তাঁর শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করেন। তাঁর সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যকে জায়গীরদারদের মধ্যে বিভক্ত করে দেন। এসঙ্গে জায়গীরদারদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করেন। বাবুরের প্রশাসন ব্যবস্থার অন্যতম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল চিঠিপত্র আদান-প্রদানের জন্য পনর মাইল অন্তর ডাক-চৌকির ব্যবস্থাকরণ। তবে একথা সত্যি যে, ত্রুটিযুক্ত রাজস্বনীতির কারণে তাঁর রাজত্বকালে অর্থনৈতিক অবস্থা চরম আকার ধারণ করে। বিনা কারণে বদান্যতা দেখাতে গিয়ে দিল্লি ও আগ্রায় প্রাপ্ত ধন-সম্পদ তিনি মুক্তহস্তে অনুচরবর্গের মধ্যে বিলি করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া বহু রাজস্বও মওকুফ করেছিলেন। ফলে প্রতিদিনের রাষ্ট্রীয় খরচের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তারও অভাবে শাসনব্যবস্থাকে সুসংহত রূপ দিতে অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়।

সমরকুশলী ও বীরযোদ্ধা হয়েও বাবুরের মতো এমন সংস্কৃতিপরায়ণ ও বিদ্বান ব্যক্তির আবির্ভাব সমসাময়িককালে মধ্য এশিয়ায় আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাবুরই একমাত্র নরপতি যিনি তাঁর আত্মজীবনীতে পাপ-পুণ্যের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। তুর্কি ভাষায় রচিত তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'তুজুক-ই-বাবুরী' তৎকালীন ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অমূল্য আকর গ্রন্থ। এছাড়া তুর্কি ও ফারসি ভাষায় তিনি কবিতা রচনা করেছেন। তুর্কি ভাষায় রচিত তাঁর 'দেওয়ান' কাব্যগ্রন্থটি খুবই উচ্চমানের গ্রন্থ। এতে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপুল মন্তব্য করেন, "মধ্য এশিয়ার ও ভারতবর্ষের ল্যাটিন ও সংস্কৃতির ভাষা ফারসিতে তিনি কীর্তিমান কবি ছিলেন এবং তাঁর মাতৃভাষা তুর্কিতে গদ্য রচনা করেন এবং কবিতায় তিনি বিশুদ্ধ ও স্বাভাবিক রীতি প্রচলন করেন।"

বাবুরের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব

বাবুর ছিলেন মধ্যযুগীয় এশিয়ার এক অনন্য সাধারণ চরিত্র এবং এক দুঃসাহসিক ও চমকপ্রদ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এ প্রসঙ্গে রায় চৌধুরী, দত্ত ও মজুমদার বলেন, "বাবুর এশিয়ার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা রোমাঞ্চকর এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারীদের অন্যতম।" ব্যক্তিগত জীবনেও বাবুর ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র, অকপট ও কোমল স্বভাবের। পরিবারের সকলের প্রতি ছিল তাঁর গভীর মমত্ববোধ। বন্ধু হিসেবে ছিলেন বেশ উঁচু মানের। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল মানবিক গুণসম্পন্ন। তিনি তাঁর পূর্বপুরুষ চেঙ্গিজ-তৈমুরের মতো রক্তপিপাসু অথবা লুণ্ঠন ও ধ্বংস সাধনের পক্ষপাতি ছিলেন না। বিজিত শত্রুর প্রতি তিনি উদারতা দেখাতেন। বাবুর ব্যক্তিগত জীবনে কঠোর নীতিবোধ মেনে চলতেন।

ধর্মের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন সুন্নি মুসলমান, কিন্তু ধর্মান্ধ ছিলেন না। ধর্মীয় আচার-আচরণে নিষ্ঠাবান ছিলেন। অপর ধর্মের মানুষের প্রতি গোঁড়া মুসলমান শাসকদের মতো নির্যাতনমূলক কোন নীতি অবলম্বন করেননি। তাছাড়া বাবুর স্বয়ং সুন্নি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী পারস্যের শাহ ইসমাইল সাফাভীর সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি করতে কোন দ্বিধা করেননি। এমনকি এক সময়ে তিনি সমরখন্দে শিয়া মতবাদীদের উৎসাহ দিয়েছিলেন। অমুসলমানদের প্রতি উদারতা ও সহিষ্ণুতা তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ঐতিহাসিক ঈশ্বরীপ্রসাদ যথার্থ মন্তব্য করেছেন, 'তাঁর যুগের অপরাপর মুসলিম নৃপতিগণ অপেক্ষা বাবুর সন্দেহাতীতভাবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন'।

সারসংক্ষেপ

মধ্য এশিয়ার ফরগনা রাজ্যের অধিপতি জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবুর তাঁর জ্ঞাতি গোষ্ঠীর চক্রান্তে ফরগনার সিংহাসনচ্যুত হয়ে অনেক চড়াই-উৎরাই পাড়ি দিয়ে কাবুল অধিকার করেন। অতপর তিনি ভারত বিজয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা তাঁকে ভারত আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

তিনি সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে সিন্ধু, ঝিলাম ও চেনাব নদী অতিক্রম করে লাহোর ও পাঞ্জাব অধিকার করার মাধ্যমে ভারত ভূমি অধিকারে প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করেন। পরবর্তীকালে দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদিকে পানিপথের যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রি.) পরাজিত করে বাবুর ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি খানুয়ার যুদ্ধে সম্মিলিত রাজপুত ও আফগান শক্তিকে এবং গোগরার যুদ্ধে সম্মিলিত আফগান বাহিনীকে পরাজিত করে ভারতে তাঁর আধিপত্য সুদৃঢ় করেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. Ishwari Prasad, A *Short History of Muslim Rule in India,* Allahabad, 1970.
২. আবদুল করিম, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন, ঢাকা, ১৯৮৮।
৩. এ. কে. এম. আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস,* ঢাকা, ১৯৭৩।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাবুর কত খ্রিস্টাব্দে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন?
(ক) ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে।

২। কত খ্রি. বাবুর লাহোর অধিকার করেন?
(ক) ১৫২২ খ্রি. (খ) ১৫২৪ খ্রি.
(গ) ১৫২৬ খ্রি. (ঘ) ১৫২৮ খ্রি.।

৩। কোন যুদ্ধে বাবুর প্রথমবারের মত কামান ব্যবহার করেন?
(ক) পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (খ) খানুয়ার যুদ্ধে
(গ) গোগরার যুদ্ধে (ঘ) পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে।

৪। খানুয়ার যুদ্ধে কোন রাজপুত নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?
(ক) রানা প্রতাপসিংহ (খ) মানসিংহ
(গ) রানা সংগ্রাম সিংহ (ঘ) রানা অরূপ সিংহ।

৫। গোগরার যুদ্ধ সংগঠিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে?
(ক) ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। বাবুর কিভাবে ফরগনা রাজ্য থেকে বিতাড়িত হন তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
২। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ-পূর্ব ভারতে বাবুরের অভিযানগুলোর বর্ণনা দিন।
৩। পানিপথের যুদ্ধের ঘটনাবলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
৪। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ও খানুয়ার যুদ্ধের মধ্যে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন?
৫। বাবুর সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মূল্যায়ন সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় বাবুরের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।
২। ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠিত যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনা দিন।
৩। বাবুরের চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।

পাঠ - ৩

হুমায়ুন

উদ্দেশ্য–

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *হুমায়ুনের সিংহাসন আরোহণ এবং পিতার নির্দেশ অনুযায়ী তিন ভ্রাতাকে সাম্রাজ্যের তিনটি অংশের শাসনকর্তা নিয়োগদান বিষয়ে জানতে পারবেন;*
- *সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে হুমায়ুন যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *আফগানদের সঙ্গে হুমায়ুনের সম্পর্ক ও তাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *শেরশাহের বঙ্গবিজয়, হুমায়ুনের চুনার দুর্গ অবরোধ ইত্যাদি বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *শেরশাহের কাছে পরাজিত এবং রাজ্যচ্যুত হয়ে হুমায়ুন যে নির্বাসিত জীবন কাটিয়েছিলেন সে সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *হুমায়ুনের রাজ্য পুনরুদ্ধার সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *হুমায়ুনের চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।*

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবুরের চার পুত্র সন্তানদের মধ্যে নাসিরউদ্দিন মুহাম্মদ হুমায়ুন ছিলেন জ্যেষ্ঠ। তাঁর অপর তিন ভাইদের নাম কামরান, আসকারী এবং হিন্দাল। হুমায়ুন ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। হুমায়ুন নামের অর্থ ভাগ্যবান; কিন্তু তাঁর মত ভাগ্যহীন বাদশা খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। বাল্যকাল থেকে তিনি পিতা বাবুরের কাছ থেকে সামরিক এবং শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। বাবুরের উত্তর ভারত বিজয়ের সময় পানিপথ ও খানুয়ার যুদ্ধে তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। মাত্র বিশ বৎসর বয়সে তিনি বাদাকশানের শাসনকর্তার পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। এসব অভিজ্ঞতার ফলে বাবুরের উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছিলেন। মৃত্যুকালে বাবুর হুমায়ুনকে নবপ্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান এবং হুমায়ুনকে তাঁর ভ্রাতাদের প্রতি ভ্রাতৃবাৎসল্য, উদারতা ও স্নেহ প্রদর্শন করতে উপদেশ দেন। সেই অনুসারে বাবুরের মৃত্যুর (২৬ ডিসেম্বর, ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দ) চারদিন পর ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর তেইশ বছর বয়সে হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

সিংহাসনে বসেই হুমায়ুন পিতার নির্দেশ অনুসারে তিন ভ্রাতাকে সাম্রাজ্যের তিনটি অংশের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। কাবুল এবং কান্দাহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন কামরান, পূর্ব হতেই তিনি ঐ দুই স্থানের শাসনকর্তা ছিলেন। আলওয়ার ও মেওয়াটের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন হিন্দাল আর আসকারীকে নিযুক্ত করা হয় সম্বলের শাসনকর্তা। পিতৃব্যপুত্র মির্জা সুলায়মানকে বাদাকশানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে হুমায়ুন নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন ঃ

প্রথমত, বাবুরের সেনাবাহিনী গঠিত ছিল মধ্য এশিয়ার নানা জাতির মানুষ দিয়ে। এরূপ সেনাবাহিনী পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল অসাধারণ ব্যক্তিত্বের। হুমায়ুন ঐরূপ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন না। ফলে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত, আফগান শক্তি বাবুরের কাছে পরাজিত হলেও তখন পর্যন্ত পূর্ব ভারতে তাঁদের যথেষ্ট শক্তি ছিল এবং মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে তৎপর ছিল।

তৃতীয়ত, রাজপুত শক্তি বাবুরের নিকট পরাজিত হলেও তাঁদের শক্তি তখনও সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়নি।

চতুর্থত, গুজরাটের শাসনকর্তা বাহাদুর শাহ হুমায়ুনের অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে উত্তর ভারতে প্রাধান্য বিস্তারে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন।

পঞ্চমত, বাবুরের ইচ্ছানুযায়ী হুমায়ুন সিংহাসন লাভের পর তাঁর তিন ভ্রাতাকে সাম্রাজ্যের তিনটি অংশের শাসনকর্তা নিয়োগ করলেও তিন ভ্রাতাই তাঁর চরম বিরোধিতা করতে থাকেন। ভ্রাতাদের মধ্যে চরম বৈরিতা হুমায়ুনের বিপদের দিনে তাঁকে অধিকতর বিপদগ্রস্ত করে তুলেছিলেন।

প্রথমে সমস্যার সৃষ্টি করলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী কামরান। তিনি কাবুল ও কান্দাহারের শাসনভার লাভ করে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করার পরপরই কামরান বলপূর্বক পাঞ্জাব, হিসার, ফিরুজা প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করে নেন। ভ্রাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃ-বিরোধ পরিহার এবং সর্বোপরি মৃত্যুশয্যায় পিতার শেষ উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধাবশত হুমায়ুন কামরানকে ক্ষমা প্রদর্শন করেন। এসঙ্গে তাঁর দখলকৃত অঞ্চলগুলোর ওপর কামরানের অধিকার স্বীকার করে নেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের সংহতি ও নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করলে হুমায়ুনের এই সিদ্ধান্ত অদূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। হিসার, ফিরুজা কামরানের অধিকারের ফলে পাঞ্জাব ও দিল্লির সংযোগপথ বিচ্ছিন্ন হলো। মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্তান থেকে সৈন্য সংগ্রহের সুযোগ থেকে হুমায়ুন বঞ্চিত হন।

বিভিন্ন সমস্যা থাকা সত্ত্বেও হুমায়ুন তাঁর রাজত্বের প্রথমদিকে স্বল্পকালের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহে সাফল্য লাভ করেছিলেন। বুন্দেলখন্ডের কালিঞ্জরের রাজা আফগানদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকার কারণে হুমায়ুন সিংহাসনে বসার ৫/৬ মাস পর কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করেন। কিন্তু রাজ্যের পূর্বদিকে আফগানগণ উদ্ধত হয়ে ওঠার সংবাদ পেয়ে তিনি কালিঞ্জরের রাজার কাছ থেকে অর্থ পেয়ে কৃতার্থ হয়ে অবরোধ তুলে নেন এবং আফগানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। রাজার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে না পেরে কালিঞ্জর দুর্গের অবরোধ তুলে নিয়ে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো ভুল করেন।

এরূপ পরিস্থিতিতে হুমায়ুন আফগানদের সংঘবদ্ধ দলকে মোকাবেলা করতে সসৈন্যে অগ্রসর হন। এই সংঘবদ্ধ দলের নেতৃত্বে ছিলেন প্রাক্তন সুলতান ইব্রাহিম লোদির ভাই মাহমুদ লোদি এবং প্রধান দুই সেনাপতি বিবন খান জালওয়ানী ও শেখ বায়জিদ কারমালি। হুমায়ুন লক্ষ্ণৌর নিকটে দৌরাহ্ নামক স্থানে সংঘবদ্ধ আফগান দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এসঙ্গে তিনি সুলতান মাহমুদ লোদিকে জৌনপুর থেকে বিতাড়িত করেন। পরে মাহমুদ লোদি বিহারে মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে ইতিহাসের পাতা থেকে লোদি বংশের বিলুপ্তি ঘটে।

দৌরাহ্-এর যুদ্ধে জয়লাভ করে হুমায়ুন শের খাঁর অধীনস্থ চুনার দুর্গ অবরোধ করেন। চার মাস এই অবরোধ স্থায়ী হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে গুজরাটের বাহাদুর শাহের আগ্রা অভিযানের সংবাদ পেয়ে হুমায়ুন শের খাঁর থেকে মৌখিক আনুগত্য আদায় করে অবরোধ তুলে নেন। হুমায়ুন চুনার দুর্গ শের খাঁর অধীনে রেখে সসৈন্য বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। শের খাঁর মৌখিক আনুগত্যে বিশ্বাস করে তাঁর ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট না করে আগ্রায় ফিরে হুমায়ুন তৃতীয়বারের মতো অদূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। হুমায়ুন বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ায় শের খাঁ শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ পেয়ে যান। এবং পরবর্তী সময়ে হুমায়ুনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শত্রুতে পরিণত হন।

বাহাদুর শাহ প্রথম থেকেই হুমায়ুনের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি মালব জয় করেন এবং খান্দেশ, বেরার ও আহম্মদনগরের সুলতানদের যুদ্ধে পরাজিত করে স্বীয় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। হুমায়ুনের বহু শত্রু আফগান দলপতিদের তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে বাহাদুর শাহ চিতোর দুর্গ অবরোধ করলে চিতোরের রাণী দুর্গাবতী বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে হুমায়ুনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু হুমায়ুন চিতোরের রাণীর ডাকে সাড়া না দিয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভুল করেন। বাহাদুর শাহ যখন তুর্কি, পর্তুগিজ বিভিন্ন দেশীয় গোলন্দাজের সাহায্য নিয়ে চিতোর দুর্গ ধ্বংসে ব্যস্ত ছিলেন, তখন হুমায়ুন তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে মালব অধিকার করে বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে মান্দাসার-এর নিকট বাহাদুর শাহ ও হুমায়ুনের মধ্যে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মান্দাসারের যুদ্ধে হুমায়ুনের নিকট বাহাদুর শাহ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন এবং মান্ডুতে পালিয়ে যান। হুমায়ুন মান্ডু দুর্গ প্রায় তেইশ মাস অবরোধ করে রাখেন। অবরোধ চালিয়ে যাওয়া কষ্টকর ভেবে অবশেষে হুমায়ুন শান্তি চুক্তির চেষ্টা চালান এবং বাহাদুর শাহও শান্তি স্থাপনের জন্য যোগাযোগ করতে থাকেন। এ পর্যায়ে হঠাৎ এক রাতে মুঘল সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে দুর্গের দরজা খুলে যাওয়ায় বাহাদুর শাহ চাম্পানের দুর্গে আশ্রয় নেন। হুমায়ুন বাহাদুর শাহকে ধরার জন্য চাম্পানের দুর্গে উপস্থিত হলে বাহাদুর শাহ ক্যাম্বেতে পালিয়ে যান। পরে সেখান থেকে পালিয়ে দিউতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন চাম্পানের দুর্গ অধিকার করেন। এর ফলে সমগ্র গুজরাট তাঁর অধিকারে আসে। হুমায়ুনের ভ্রাতা আসকারী গুজরাটের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। গুজরাট এবং মালব অধিকার ছিল হুমায়ুনের কৃতিত্বের মহান স্মারক। এই বিজয়ের পর দুই ভাই মিলে কিছুকাল আনন্দ উৎসব করলেন। কিন্তু বিজিত রাজ্যের সুরক্ষায় কোন স্থায়ী পদক্ষেপ নিলেন না। এই সুযোগে বাহাদুর শাহ পর্তুগিজদের সহযোগিতায় হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। কিন্তু হুমায়ুনের পক্ষে বাহাদুর শাহকে বাধা দেবার সময় ছিল না। কারণ সাম্রাজ্যের পূর্বদিকে আফগান দলপতিগণ পুনরায় শের খাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহী হয়ে উঠলে হুমায়ুনকে সেদিকে মনযোগ দিতে হয়। এছাড়া ইতোমধ্যে বাহাদুর শাহের অনুকূলে গুজরাটের নানাস্থানে স্থানীয় নেতৃত্বে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ফলে গুজরাট থেকে আসকারী দিল্লি ফিরে আসতে বাধ্য হন। আর এ সুযোগে বাহাদুর শাহ গুজরাট ও মালব পুনরুদ্ধার করেন। এইভাবে শুধুমাত্র রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার জন্য গুজরাট ও মালব দখল করেও পুনরায় হুমায়ুনের হাতছাড়া হয়ে যায়।

১৫৩০ থেকে ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে হুমায়ুন যখন গুজরাট ও মালব নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তখন শের খাঁ বিহারে নিজের ক্ষমতার ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। প্রকৃতপক্ষে শের খাঁ চুনার দুর্গকে কেন্দ্র করে শুধু ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেননি, তিনি সেখানকার প্রভুতে পরিণত হয়েছিলেন। এমন কি অতর্কিতে বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন।বঙ্গদেশের সুলতান মাহমুদ শাহ ছিলেন দুর্বলচেতা শাসক। দেশরক্ষার জন্য আফগান শত্রুর মোকাবেলা করার শক্তি বা সাহস কোনটাই তাঁর ছিল না। তিনি তের লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ও কিউল থেকে সক্‌রিগলী পর্যন্ত শের খাঁকে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু তাতেও বাংলা রক্ষা পেল না। শের খাঁ পুনরায় (১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে) বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন এবং বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড় অবরোধ করেন। হুমায়ুন শের খাঁর উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁকে দমন করার উদ্দেশ্যে ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে শের খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। কিন্তু চুনার দুর্গ অবরোধে অযথা কালবিলম্ব করেন। চুনার দুর্গ অধিকার করতে হুমায়ুনের সময় লাগে ছয় মাস। হুমায়ুনের এই অযথা কালক্ষেপনের ফলে শের খাঁ তখন বঙ্গদেশ জয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। হুমায়ুন যদি তৎক্ষণাৎ চুনার দুর্গ দখল করে গৌড়ে উপস্থিত হতেন, তাহলে বঙ্গদেশ ও সুলতান রক্ষা পেত এবং শের খাঁও পরাস্ত হতেন। কিন্তু হুমায়ুন তা না করে বারাণসী চলে যান। এই সুযোগে শের খাঁ ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল গৌড় অধিকার করে সেখানে প্রাপ্ত ধনসম্পদ রোটাস দুর্গে স্থানান্তর করেন। এই দুর্গ শের খাঁ আগে থেকেই দখলে রেখেছিলেন।

এদিকে বঙ্গদেশ থেকে পলাতক সুলতান মাহমুদ শাহ হুমায়ুনকে কালবিলম্ব না করে বঙ্গদেশ অধিকার করতে অনুরোধ করেন। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট তিনি বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড় অধিকার করেন। শের খাঁ ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী সামরিক নেতা। তিনি হুমায়ুনের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে না গিয়ে চতুরতার সঙ্গে দক্ষিণ বিহারে চলে যান। এদিকে বর্ষা নামার ফলে হুমায়ুনকে দীর্ঘ ছয়মাস বঙ্গদেশে বাধ্য

হয়ে অবস্থান করতে হয়। তখন শের খাঁ চুনার দুর্গ পুনরুদ্ধার করেন। এছাড়া বারাণসী, জৌনপুর প্রভৃতি অঞ্চল জয় করে তিনি কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হন। এসব অঞ্চল অধিকার করার ফলে হুমায়ুনের বঙ্গদেশ থেকে আগ্রা প্রত্যাবর্তনের পথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এই সংবাদ পেয়ে হুমায়ুন শঙ্কিত হয়ে গৌড় ত্যাগ করে সসৈন্যে আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বক্সারের নিকট চৌসা নামক স্থানে শের খাঁ ও তাঁর আফগান অনুচরবর্গ হুমায়ুনকে বাধা প্রদান করেন। এখানে ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন হুমায়ুনের সঙ্গে শের খাঁর এক প্রচন্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে হুমায়ুন সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। বহু মুঘল সৈন্য গঙ্গা নদী অতিক্রম করতে গিয়ে প্রাণ হারায় এবং অনেকেই শের খাঁর সেনাবাহিনী কর্তৃক বন্দি হন। নিজাম নামে এক ভিস্তিওয়ালা তার মশকের সাহায্যে কোনক্রমে হুমায়ুনকে গঙ্গা নদী পার করে দিলে তিনি প্রাণে রক্ষা পান। চৌসার যুদ্ধে জয়লাভ শের খাঁকে অভাবনীয় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে। এই যুদ্ধ জয়লাভের ফলে পূর্ব ভারত কিছুদিনের জন্য মুঘল শাসনের বাইরে থাকে। কনৌজ থেকে আসাম, রোটাস থেকে বীরভূম পর্যন্ত অঞ্চলে শের খাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের শাসক হলেন; ধারণ করলেন রাজকীয় উপাধি 'শেরশাহ'। এসঙ্গে নিজ নামে মুদ্রা চালু করেন।

চৌসার যুদ্ধে অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে হুমায়ুন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। পরের বছর হুমায়ুন হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করার জন্য সসৈন্যে প্রস্তুত হন। এবং ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ এপ্রিল কনৌজের নিকটে বিলগ্রাম নামক স্থানে শেরশাহকে আক্রমণ করেন। উল্লেখ্য, শেরশাহের বিরুদ্ধে এ আক্রমণে তিনি তাঁর ভ্রাতৃদ্বয় ও অভিজাতদের কোন সাহায্য পাননি। এই যুদ্ধেও হুমায়ুন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এবার কোন রকমে হুমায়ুন প্রাণ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। শেরশাহ দ্রুত দিল্লি ও আগ্রা অধিকারভুক্ত করে উত্তর ভারতের অধিপতি হয়ে ওঠেন। আর পরাজয়ের ফলে রাজ্যচ্যুত হয়ে হুমায়ুন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে (১৫৪০–১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দ) বাধ্য হলেন।

হুমায়ুনের এই দুর্দিনে তাঁর ভ্রাতাগণ সংঘবদ্ধভাবে শেরশাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার কোন প্রয়োজন উপলব্ধি করেননি। কামরানের সাহায্য লাভের আশায় হুমায়ুন লাহোরে যান। কিন্তু কামরান শেরশাহের ভয়ে ভীত হয়ে কাবুলে পলায়ন করেন এবং শেরশাহকে পাঞ্জাব দান করে তাঁর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। হৃতসর্বস্ব হতভাগ্য হুমায়ুন সিন্ধু থেকে সৈন্য সংগ্রহে এবং মাড়বারের রাজার নিকট আশ্রয় লাভে ব্যর্থ হয়ে অমরকোটের রাণা প্রসাদের দরবারে আশ্রয় নেন। সেখানে অবস্থানকালে পুত্র আকবরের জন্ম হয়। পরে অমরকোট থেকে কান্দাহারে নিজ ভ্রাতা আসকারীর রাজ্যে গমন, সেখানে নিরাপদ নয় মনে করে অবশেষে পারস্যের শাহ তহসাম্প-এর দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হুমায়ুন তাঁর হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য শাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। শাহ তাঁকে সাহায্য করার বিনিময়ে দুটি শর্ত আরোপ করেন– (১) হুমায়ুনকে শিয়াধর্ম গ্রহণ করতে হবে এবং ভারতে শিয়াধর্ম বিস্তার করতে হবে, (২) আফগানিস্তানে হুমায়ুনের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য হুমায়ুনকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করা হবে, কিন্তু তার বিনিময়ে আফগানিস্তান পুনরুদ্ধার করার পর কান্দাহার শাহের হাতে তুলে দিতে হবে। চরম অপমানজনক হওয়া সত্ত্বেও হুমায়ুন শর্ত দু'টি মেনে নেন। ফলে শাহ হুমায়ুনকে ১৪,০০০ সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন। এই সামরিক সাহায্য নিয়ে ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন কান্দাহার অধিকার করেন। কামরান আত্মসমর্পন করেন। কান্দাহার বিজয়ের পর পারস্য বাহিনী হুমায়ুনের হয়ে আর যুদ্ধ করতে রাজি হলো না। তখন হুমায়ুন তাঁর সংগৃহীত সৈন্যবাহিনী দ্বারা আক্রমণ চালিয়ে পারস্যের শাহের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ করে পারস্য বাহিনীকে কান্দাহার থেকে হটিয়ে দেন। ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর এক প্রকার বিনা বাধায় কাবুল অধিকার করেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কামরানকে বন্দি করে তাঁর চক্ষু দু'টি উৎপাটন করে মক্কায় প্রেরণ করা হলো। আসকারীও মক্কায় আশ্রয় নেন এবং হিন্দাল এক নৈশ আক্রমণে প্রাণ হারান। এইভাবে ভ্রাতাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক বিজয় সম্পন্ন করে ১৫৫৪ খ্রি. নভেম্বর মাসে হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধারের জন্য অগ্রসর হন। ইতোমধ্যে শের শাহের মৃত্যু হলে তাঁর অযোগ্য বংশধরগণ দিল্লির সিংহাসন নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত থাকার ফলে হুমায়ুনের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার বহুলাংশে সহজ হলো। তিনি অনায়াসে বিনা বাধায় ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোর অধিকার করে নেন। বিদ্রোহী আফগানগণ পাঞ্জাবের শাসনকর্তা সিকান্দার শূরকে সুলতান বলে ঘোষণা দেন। হুমায়ুন সিকান্দার শূরকে শরহিন্দের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই

মাসে হুমায়ুন দিল্লি ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করেন। এভাবে তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের এক উল্লেখযোগ্য বিস্তৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন। কিন্তু দীর্ঘ পনর বৎসর নির্বাসিত জীবনের দুঃখ-দুর্দশা তাঁকে কতটুকু বাস্তববাদী ও দূরদর্শী করে তুলেছিল সে পরিচয় দেবার সুযোগ তাঁর ঘটেনি। সদ্য পুনপ্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনাকালে অর্থাৎ ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি সন্ধ্যায় নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে পাঠাগারের সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নামার সময় পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। হুমায়ুনের সাময়িক জ্ঞান ফিরলে অবস্থা বিপজ্জনক ভেবে আকবরকে পাঞ্জাব থেকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। অতপর ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি হুমায়ুন মারা যান।

হুমায়ুনের ব্যর্থতার কারণ

একাধিক কারণে হুমায়ুন ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। রাজনৈতিক দূরদর্শিতা থাকলে হয়তো হুমায়ুন নিজেকে ভাগ্য বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারতেন। এই কারণে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, হুমায়ুনের ভাগ্য বিপর্যয় তাঁর নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য ঘটেছিল।

প্রথমত, তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেই পিতার অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী সাম্রাজ্যের কিছু অংশ তাঁর তিন ভ্রাতার মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন।কিন্তু তাঁরা হুমায়ুনের চরম বিপদের দিনে সাহায্য করেননি। সাম্রাজ্যের স্বার্থে বিশ্বাসঘাতক ও স্বার্থপর ভ্রাতাদের শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করা উচিত হয়নি।

দ্বিতীয়ত, হুমায়ুন সিংহাসন লাভের অব্যবহিত পর থেকেই বিভিন্ন স্থানে অহেতুক যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতে থাকেন। যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত না হয়ে তিনি যদি সে সময় নবপ্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব এবং সংহতির প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, তাহলে মুঘল সাম্রাজ্যের স্বার্থ অধিক মাত্রায় রক্ষিত হতো।

তৃতীয়ত, হুমায়ুন বিহারের আফগান শাসনকর্তা শের খাঁর উত্তরোত্তর শক্তিবৃদ্ধির স্বরূপ প্রথম অবস্থায় অনুধাবন করতে সক্ষম হননি। শেষ পর্যন্ত তিনি ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে শের খাঁর বিরুদ্ধে যখন অগ্রসর হন তখন আর শের খাঁকে পরাজিত করা সম্ভব ছিল না।

চতুর্থত, হুমায়ুনের গুজরাট অভিযানও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। গুজরাট অভিযানকালে যে পরিমাণ অর্থ ও লোকক্ষয় হয় তাতে হুমায়ুনের দুর্বলতা বৃদ্ধি পায়। গুজরাট অভিযানের ব্যর্থতা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

পঞ্চমত, হুমায়ুনের মধ্যে নেতৃত্ব দান করার মতো বিশেষ ক্ষমতা ছিল না। তিনি সৈন্যবাহিনীকে উৎসাহ ও উদ্দীপনায় উজ্জীবিত করে তুলতে অসমর্থ হয়েছিলেন। এছাড়া হুমায়ুনের চরিত্রের মহানুভবতা এবং সকলের প্রতি অনুকম্পা এমনকি বিদ্রোহী সেনাপতিদের প্রতি অনুকম্পা সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলাকে বহুল পরিমাণে ক্ষুন্ন করে।

ষষ্ঠত, স্বল্পকালের জন্য তিনি প্রচন্ডভাবে উদ্যোগী হতে পারতেন, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী কোন পরিকল্পনা সাফল্যমন্ডিত করতে যে পরিমাণ উদ্যোগ ও আয়োজনের প্রয়োজন ছিল সেরূপ উদ্যোগী হতে পারেননি।

হুমায়ুনের চরিত্র ও কৃতিত্ব

হুমায়ুন যে একজন যথার্থ সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন সে সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই। সমকালীন ও আধুনিক ঐতিহাসিক সকলেই একমত যে, হুমায়ুন দয়াবান, শান্ত স্বভাব, স্নেহশীল ও হৃদয়বান নরপতি ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরও তাঁর আদেশ পালন থেকে বিচ্যুত হননি। নিজের সিংহাসন পণ করেও মৃত্যুশয্যায় দেয়া পিতার আদেশ অনুযায়ী ভ্রাতাদের সাম্রাজ্যের অংশ ভাগ করে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি তাঁর উদারতার এত মাত্রাধিক্য ঘটেছিল যে, কখনো কখনো এর জন্য তাঁকে বিপদে পড়তে

হয়েছিল। ভ্রাতাদের চরম শত্রুতা সত্ত্বেও তাদের প্রতি উদার ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন। অভিজাতবর্গ সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার জন্য কামরানের প্রাণদন্ডের অনুরোধ করলেও হুমায়ুন তা করেননি। তিনি বলেছিলেন, "বুদ্ধির বিচারে আমি আপনাদের সঙ্গে একমত কিন্তু অন্তরের দিক দিয়ে এই পরামর্শ গ্রহণে অক্ষম।" এতেই হুমায়ুনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মেলে।

দৈহিক সামর্থের দিক বিচার করলে হুমায়ুন সক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পিতা বাবুরের সহযোগী হিসেবে পানিপথ ও খানুয়ার যুদ্ধে তিনি শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দিয়েছেন। চরম সংকটেও তিনি অবিচল থাকতে পারতেন। অসীম দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করার মানসিকতা ছিল তাঁর, যা তাঁর পনর বৎসর নির্বাসিত জীবনে দেখা গেছে। চৌসার ও কনৌজের যুদ্ধে শেরশাহ যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, সরহিন্দের যুদ্ধেও হুমায়ুন একই রকম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

হুমায়ুনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গুণ- অমায়িক ব্যবহার ও আনন্দপ্রবণ মেজাজ। ভাগ্য বিপর্যয় ও দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে থেকেও তিনি তাঁর চিত্তের সরলতা বা সহৃদয়তাকে হারাতে পারেননি। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহযোগী ও অধস্তন ব্যক্তিদের প্রতি সমানভাবে প্রীতিমূলক আচরণ করতেন। এই স্বভাবসিদ্ধ সহৃদয়তা একজন শাসকের বিপদেরও কারণ হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই কারণে ঐতিহাসিক ফিরিস্তা মন্তব্য করেছেন, চরিত্রের সদগুণাবলির দিক দিয়ে হুমায়ুন সর্বশ্রেষ্ঠ।

হুমায়ুন একজন নিষ্ঠাবান ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তবে তাঁর মধ্যে কোন ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। নামাজ পড়তেন, কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতি কোন বিরূপ ধারণা পোষণ করতেন না।

বাবুরের মতো হুমায়ুনের সাহিত্য প্রতিভা না থাকলেও সাহিত্য প্রীতি ও কবি প্রতিভা তাঁর চরিত্রের অন্যতম গুণ ছিল। গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল।

শাসক হিসেবে হুমায়ুন কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেননি। তাঁর রাজত্বের প্রথম দশ বৎসর তিনি শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে তেমন কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। ঐতিহাসিক রাসব্রুক উইলিয়াম মনে করেন, তাঁর পিতার কাছ থেকে তখন তিনি এক কম্পমান সাম্রাজ্য পেয়েছিলেন। সে সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব নির্ভর ছিল অবিরাম যুদ্ধের মাধ্যমে। অবিরাম যুদ্ধ করতে গিয়ে এবং ভ্রাতাদের বিরোধিতায় বিব্রত হয়ে হুমায়ুন শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেননি। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিক ড. ত্রিপাঠী বলেন, তাঁর প্রথম দশ বৎসরের শাসনকালে কামরানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো ছিল। যখন কামরান দেখলেন যে, হুমায়ুন শাসক হিসেবে ব্যর্থ তখনই তিনি হুমায়ুনের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হন। প্রকৃতপক্ষে, নব প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষার জন্য এবং আফগানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য যে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রয়োজন ছিল, তা হুমায়ুনের মধ্যে ছিল না। হুমায়ুনের দুর্ভাগ্য যে, তাঁর অশেষ গুণাবলি থাকা সত্ত্বেও তিনি শাসক হিসেবে ব্যর্থ হন।

সবশেষে হুমায়ুনের ব্যর্থতা পর্যালোচনা করার সময় মনে রাখা উচিত বাবুরকে লড়াই করতে হয়েছিল ইব্রাহিম লোদির সঙ্গে, আর হুমায়ুনকে লড়তে হয়েছিল 'মহান আকবরের অগ্রদূত' শেরশাহের বিরুদ্ধে। তাই ব্যর্থতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে হুমায়ুন এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। বিশেষত যথাসময়ে মুঘল শক্তির পুনরুদ্ধার করা প্রকৃতই তাঁর এক গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব– যা পরবর্তীকালে আকবরের ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করেছিল।

সারসংক্ষেপ

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবুরের মৃত্যুর পর পুত্র হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। পিতার নির্দেশ অনুসারে তিন ভ্রাতা কামরান, হিন্দাল ও আসকারীকে সাম্রাজ্যের তিনটি অংশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সিংহাসনে বসে তিনি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। তন্মধ্যে পূর্ব ভারতে আফগান শক্তির উত্থান ঘটে। প্রথম দিকে আফগান শক্তির মোকাবিলায় হুমায়ুন সাফল্য লাভ করলেও

পরবর্তীকালে চৌসার (১৫৩৯ খ্রি.) এবং বিলগ্রামের যুদ্ধে (১৫৪০ খ্রি.) শেরশাহের নিকট পরাজিত হয়ে হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসন হারিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হন। এই দুর্দিনে হুমায়ুন ভাইদের নিকট থেকে কোন সহযোগিতা পাননি পরে পারস্যের শাহের সহযোগিতায় দীর্ঘ পনর বৎসর পর শেরশাহের উত্তরাধিকারী সিকান্দার শূরকে সরহিন্দের যুদ্ধে (১৫৫৫ খ্রি.) পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। এই বিজয়ের সুফল তিনি বেশিদিন ভোগ করতে পারেননি। ১৫৫৬ খ্রি. তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India,* Allahabad, 1970.
২. এ. কে. এম. আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৭৩।
৩. আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, ঢাকা, ১৯৮৮।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। হুমায়ুন কত খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন?
(ক) ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে।

২। কত খ্রি. বাহাদুর শাহ চিতোর দুর্গ অবরোধ করেন?
(ক) ১৫৩০ খ্রি. (খ) ১৫৩১ খ্রি.
(গ) ১৫৩২ খ্রি. (ঘ) ১৫৩৩ খ্রি.।

৩। কত খ্রিস্টাব্দে শের খাঁ গৌড় আধিকার করেছিলেন?
(ক) ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল (খ) ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল
(গ) ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল (ঘ) ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল।

৪। চৌসার যুদ্ধে কে পরাজিত হয়েছিলেন?
(ক) হুমায়ুন (খ) শেরশাহ
(গ) আকবর (ঘ) বাবুর।

৫। সরহিন্দের যুদ্ধের বিজেতা কে ছিলেন?
(ক) বাবুর (খ) শেরশাহ।
(গ) হুমায়ুন (ঘ) কামরান।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। হুমায়ুন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার একটি বিবরণ দিন।
২। চৌসার যুদ্ধের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
৩। হুমায়ুনের নির্বাসিত জীবনের ওপর একটি টীকা লিখুন।
৪। হুমায়ুনের ব্যর্থতার কারণগুলো উল্লেখ করুন।
৫। হুমায়ুনের চারিত্রিক গুণাবলির একটি বিবরণ দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। হুমায়ুনের রাজত্বকালের একটি বিবরণ দিন। এসঙ্গে তাঁর ব্যর্থতার কারণ নির্দেশ করুন।

২। হুমায়ুনের সঙ্গে শেরশাহের সংঘর্ষের ঘটনাবলির ধারাবাহিক বর্ণনা দিন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ

পাঠ-১ ঃ ১। (গ); ২। (খ); ৩। (খ); ৪। (গ); ৫। (ক)।
পাঠ-২ ঃ ১। (ক); ২। (খ); ৩। (ক); ৪। (গ); ৫। (গ)।
পাঠ-৩ ঃ ১। (খ); ২। (ঘ) ৩। (গ); ৪। (ক); ৫। (গ)।

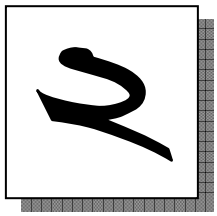

ব্রিটিশ ও বাংলায় আফগান শাসন

শূর আফগান দলপতি শেরশাহ ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবুর পুত্র হুমায়ুনকে বিলগ্রামের যুদ্ধে (১৫৪০খ্রি.) পরাজিত করার মাধ্যমে শেষবারের মত আফগান জাতি দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে উত্তর ভারত এবং বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভারতের প্রাচীন শাসন ব্যবস্থার সংস্কার সাধনপূর্বক দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। হুমায়ুন কর্তৃক দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধারের আগ পর্যন্ত শেরশাহ ও তাঁর বংশের উত্তরাধিকারীগণ ভারতবর্ষ শাসন করেন। শেরশাহ ও তৎপুত্র ইসলাম শাহের রাজত্ব পর্যন্ত বাংলা দিল্লির অধীনস্থ প্রদেশ হিসেবে শাসিত হতো। তবে ইসলাম শাহ পরবর্তী দিল্লির শূর আফগানদের শাসনামলে বাংলার শাসনকর্তাগণ এবং কররানী আফগানগণ (আফগানদের অন্য একটি গোত্র) স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেন। বাংলায় কররানী আফগান শাসকদের অন্যতম শাসক দাউদ কররানীকে মুঘল সম্রাট আকবর পরাজিত করে বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। আলোচ্য 'দিল্লি ও বাংলায় আফগান শাসন' ইউনিটে শেরশাহ কর্তৃক দিল্লির সিংহাসন আরোহণ, তাঁর রাজ্য বিস্তার, শাসন সংস্কার, চরিত্র ও কৃতিত্ব এবং বাংলায় শূর ও কররানী আফগান শাসন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত ইউনিটকে নিম্নোক্ত দুটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে ঃ